ঃ এই সংখ্যায় ঃ
১) জলাভূমির জীবন দর্শন ঃ সমীক্ষা, ২) সংখ্যায় ছন্দ, বেজায় আনন্দ, ৩) রিপোর্ট, ৪) হিউম্যান প্রোটিওম অরগানাইজেশন, ৫) ফুকুশিমা ঃ অতঃকিম

বিজ্ঞান অন্বেষক

গ্রাহক মূল্য
বার্ষিক ১৫ টাকা, যোগাযোগ ঃ বিজ্ঞান অন্বেষক, প্রযত্নে : বিজ্ঞান দরবার, ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড, (বিনোদনগর)
পোঃ কাঁচরাপাড়া-৭৪৩১৪৫
জেলা ঃ উত্তর ২৪ পরগণা।

বর্ষ-৯ সংখ্যা - ২ মার্চ - এপ্রিল / ২০১২ RNI No. WBBEN/03/11192 মূল্য : ২

বাংলায় সাম্প্রতিক গবেষণা : পিছিয়ে নেই বাঙালিরা

বিজ্ঞান মানেই নিত্য নতুন আবিষ্কার, নতুন তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা, অজানাকে জানা, অচেনাকে চেনা, নামী-দামী বিজ্ঞান পত্রিকা, বিভিন্ন ওয়েব সাইট, এমনকি দৈনিক সংবাদপত্রেও বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কারের ও গবেষণার কথা থাকে। কিন্তু সেই সব আবিষ্কারের পেছনেও থাকে আরও অনেক বিজ্ঞানীর নিরলস সাধনা, থাকে পরোক্ষ প্রভাব। তেমন বিজ্ঞানী বা গবেষক বাংলায় কম নেই। এমন বহু বিষয় নিয়ে তাঁরা গবেষণা করছেন এবং নতুন নতুন আবিষ্কার করছেন যা আগামী দিনে জনকল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। সাধারণ মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে থাকা সেই সব গবেষণার কিছু নমুনা পেশ করা এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য। (উৎস ঃ প.ব. রাজ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কংগ্রেস ২০০৯, ২০১১)।

১) ব্যাঙের চামড়া থেকে জৈব কীটনাশক ঃ

গবেষক : রাজীব ঘোষ, কে.এম. হাসিব, কৌশিক দে এবং শ্রীবীর সেন। দূর্গাপুর কলেজ অফ কমার্স অ্যান্ড সায়েন্স, বর্ধমান।

ট্রান্সজেনিক বা জিন প্রতিস্থাপিত উদ্ভিদ (যেমন বিটি তুলো, বিটি বেগুন ইত্যাদি) নিয়ে এখন দুনিয়া জুড়ে বিতর্ক চলছে। বহু কীটপতঙ্গ এখন বিটি-টক্সিন প্রতিরোধী হয়ে উঠেছে। এই অবস্থায় গবেষকরা ভিন্ন জৈব কীটনাশকের খোঁজ করার গুরুত্ব উপলব্ধি করে কুনোব্যাঙের ত্বকের গুটিতে প্রাপ্ত রস থেকে জৈব কীটনাশক তৈরি করেছেন। এই রস মশা মারার ক্ষেত্রে খুব কার্যকরী বলে গবেষকরা জানিয়েছেন। 9%

এরপর 2 পাতায়

জাপানে দুধে তেজস্ক্রিয়তা, আর একটি চুল্লি বন্ধ

১১ মার্চ '১১ উত্তর জাপানের ফুকুশিমার পরমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে দূর্ঘটনার সময় তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী কানোর নির্দেশে প্রথমে ৫০ হাজার, পরে আরও ৫০ হাজার সেনা নিয়োগ করা হয়েছিল, ফুকুশিমার তেজস্ক্রিয় এলাকা অধিবাসীদের তেজস্ক্রিয় এলাকার বাইরে আনার জন্য। ফুকুশিমা ঘিরে ২০ মাইল এলাকা

এরপর 6 পাতায়

চোখের সমস্যা ও তার ভেষজ প্রতিকার

'চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে' কবির এই বাণী এক অমোঘ সত্যের উপলব্ধি, চোখ যদি ঠিক না থাকে তবে কোনো কিছুরই উপলব্ধিগত সত্য উপনীত হওয়া অসম্ভব। চোখ আমাদের পৃথিবীকে চেনবার, জানবার, উপলব্ধি করার একমাত্র ইন্দ্রিয় - যার সাহায্য ছাড়া এই জঙ্গম পৃথিবীর অনুভূতি হা হস্তিদর্শনের

এরপর 4 পাতায়

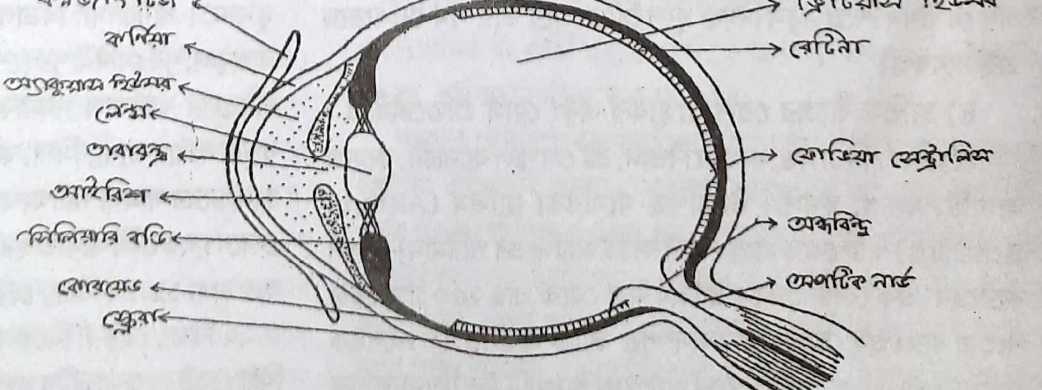

লম্বচ্ছেদে মানুষের চোখের বিভিন্ন অংশ

স্কেচ – দেবরাজ দে

পিছিয়ে নেই বাঙালিরা

1 পাতার পর

Nacl মিশিয়ে গুটি থেকে নির্যাসটি তৈরি করা হয়েছে। নির্যাসের প্রোটিন অংশটিই কীটনাশকের কাজ করে। গবেষকরা গিনিপিগের ওপর প্রয়োগ করে দেখেছেন কোনও পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হয় না।

২) ক্যান্সারের চিকিৎসায় অশ্বগন্ধা ঃ গবেষক : তানিয়া দাস, শিবব্রত মুখোপাধ্যায়, সুশান্ত রায়চৌধুরী, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কেমিক্যাল বায়োলজি।

অশ্বগন্ধা (Withania Somnifera) উদ্ভিদটির ভেষজগুন প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে উল্লেখ রয়েছে। একে বলা হয় ভারতীয় জিনসেং। এই উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত রাসায়নিক 'Withaferin A' এর গঠন নিরূপন করেছেন উল্লেখিত বঙ্গ গবেষকরা। ইতিমধ্যে এই রাসায়নিকের ব্লাড ক্যান্সার ও স্তন ক্যান্সার প্রতিরোধী ভূমিকা প্রমাণিত। বাঙালি গবেষকত্রয়ী আবিষ্কার করেছেন যে ওই রাসায়নিক বৃহদন্ত্রের ক্যান্সার নির্মূলে বেশ সক্রিয়। কোষ বিভাজনের সময় বেমতন্তু ও ক্রোমোজোমের অসম বিন্যাসের ফলে ক্যান্সার হয়। এই বিন্যাস সঠিক কিনা নির্ধারণ করে Spindle assembly check point, এই check point এ ত্রুটি হলেই বেমতন্তু ও ক্রোমোজোমের বিন্যাস বেঠিক হয়ে যায় ও ফলশ্রুতিতে ক্যান্সার হয়। এই check point কয়েকটি জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। গবেষকত্রয়ী বৃহদন্ত্রের ক্যান্সার আক্রান্ত কোষের ওই রাসায়নিক প্রয়োগ করে দেখেছেন check point নিয়ন্ত্রক জিনের প্রকাশ প্রভাবিত হয়।

৩) ব্লাড সুগার ও ব্লাড কোলেস্টেরলের মাত্রা হ্রাসে বেল - এর ভূমিকা ঃ গবেষক : বিকাশ মন্ডল, রসায়ন বিভাগ, বিজয়নারায়ণ মহাবিদ্যালয়, ইটাচুনা, হুগলী।

উল্লেখিত গবেষক বেল (Aegle marmelos) থেকে যে গঁদ পাওয়া যায় তার ভৌত-রাসায়নিক ধর্ম ও ভেষজগুণ মূল্যায়ন করেছেন। বেলে গঁদের পরিমান ২ শতাংশ। শুকনো বেলের গঁদ পুড়িয়ে ৩.৩ শতাংশ ভষ্ম পাওয়া যায়। এই ভষ্মে আছে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, অক্সালিক অ্যাসিড, আম্লিক পলিস্যাকারাইড, আর নেই কোনও ফেনলিক যৌগ। চার সপ্তাহ ধরে ইঁদুরের উপর ওই গঁদ প্রয়োগ করে গবেষক দেখেছেন যে রক্তে শর্করা ও কোলেস্টেরলের মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। সুতরাং আগামী দিনে ব্লাড সুগার ও ব্লাড কোলেস্টেরল কমাতে বেলের গঁদ যে ঔষধ শিল্পে নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে তার পথ দেখিয়েছে এই গবেষণা।

৪) ছাতিম বীজের তেল স্বাস্থ্যকর এবং রোগ প্রতিরোধী ঃ

গবেষিকা : মিতা দত্ত, রসায়ন বিভাগ, শ্রী গোপাল ব্যানার্জী, কলেজ বাগাটি, মগরা, হুগলী। উল্লেখিত গবেষিকা ছাতিম (Alstoria Schalaris) বীজ থেকে প্রাপ্ত তেলে ফ্যাটি অ্যাসিডের পরিমান নির্ধারণ করেছেন। এক কেজি শুকনো ছাতিম বীজ থেকে প্রায় ২৫০ গ্রাম তেল পাওয়া যায়। ওই তেলে প্রধান অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড হল ওলেইক অ্যাসিড (৬৫.৬৬ শতাংশ)। অপর অসম্পৃক্ত ও ফ্যাটি হল লিনোলেয়িক অ্যাসিড (১২.১৫ শতাংশ)। অন্য দিকে সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড আছে পামিটিকঅ্যাসিড (৯৩.৭৭ শতাংশ) ও স্টিয়ারিকঅ্যাসিড (৮.৮২ শতাংশ), লিনোলেয়িক অ্যাসিড যে করোনারি হৃদরোগ ও উচ্চরক্তচাপ কমাতে অত্যন্ত কার্যকর তা সারা বিশ্বে আজ স্বীকৃত। তাছাড়া কোষ পর্দার গঠনে ও বিপাক নিয়ন্ত্রণকারী যৌগ তৈরির জন্য লিনোলেয়িক অ্যাসিড প্রয়োজন হয়। সুতরাং এই তেল হৃদরোগ ও উচ্চরক্তচাপ প্রতিরোধে ব্যবহৃত হতে পারে। তাছাড়া গবেষিকা প্রমাণ করেছেন যে এই তেল Bacillus subtilis, Escherichia সহ বিভিন্ন গ্রাম পজিটিভ ও গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়াকে দমন করতে দারুন কার্যকর। সুতরাং ছাতিম বীজের তেল ঔষধ শিল্পেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

৫) রোগ প্রতিরোধে পান ঃ গবেষিকা / গবেষক : পারমিতা ঘোষ, স্নেহাশিস পাল। হেরিটেজ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, চৌবাগা রোড, আনন্দপুর, কলকাতা-৭০০১০৭।

পান (Piper betele) এর ভেষজ গুনের কথা প্রাচীন আয়ুর্বেদশাস্ত্রে উল্লেখিত আছে। ভারতসহ দক্ষিণ-পূর্বএশিয়ার দেশগুলোতে এটি একটি প্রচলিত ঔষধি। তবে পানের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বর্ধক কোনও গুন আছে কিনা জানা ছিল না। গবেষকদ্বয় তিনটি মাত্রার পানপাতার নির্যাস ইঁদুরের ওপর প্রয়োগ করে দেখেন যে ইঁদুরের কোষীয় অনাক্রম্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই আবিষ্কার নিঃসন্দেহে আগামী দিনে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বর্ধক হিসেবে পানের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে।

৬) জল দূষণ রোধে কেশরদাম ঃ গবেষক : বি. মুখোপাধ্যায় এবং এস. ঘোষ, উদ্ভিদ বিদ্যা বিভাগ, এম এই সি উইমেন্স কলেজ, বর্ধমান। অগভীর স্থির জলাশয়ের একটি পরিচিত উদ্ভিদ হল কেশরদাম (Jussiala repens)। অগভীর জলাশয়ে নানা পরিবেশ-দূষক জমা হয়, তাতেই কেশরদাম বাঁচে। ফলে কেশরদাম জলাশয় থেকে দূষকগুলি শোষন করে সেগুলিকে তার প্রয়োজনীয় বস্তুতে রূপান্তরিত করে। ফলে জলাশয় দূষণমুক্ত হয়। গবেষিকা দ্বয় দেখেছেন, কেশরদাম জলাশয় থেকে জলে দ্রবীভূত ভারী ও বিষাক্ত ধাতু যথা সিসা, পারদ এবং ধাতুকল্প আর্সেনিক শোষণ করতে সক্ষম।

৭) ভারী ধাতু দ্বারা জলদূষণ রোধে কচুরিপানার ভূমিকা ঃ

গবেষক : আশিস পাত্র, সৌম্যজিৎ বেরা এবং নিখর রঞ্জন মধু, উদয়নারায়ণপুর সারদাচরণ ইনস্টিটিউশন, উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া (প্রথম দু'জন)। প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, বাজকুল মিলনী মহাবিদ্যালয়, কিশমত বাজকুল, পূর্ব মেদিনীপুর (শেষের জন)। গবেষকরা কলকাতা শহরতলি অঞ্চলের বর্জ্যজল সঞ্চয়কারী একটি জলাভূমিতে সমীক্ষা চালিয়ে কচুরিপানার তামা, সিসা, ক্যাডমিয়াম, নিকেল ও জিঙ্ক ধাতু শোষণ ও স্থানান্তরের সামর্থ্য পরীক্ষা করেছেন। কচুরিপানার মূল ও বিটপ অংশের কোষে দূষকগুলি সঞ্চিত হয়। কচুরিপানার ওই সব ধাতু শোষণ ক্ষমতা হল তামা ১৯.১২ কিগ্রা/ হেক্টর, সিসা ৫.০৭ কিগ্রা/ হেক্টর, ক্যাডমিয়াম ০.২২ কিগ্রা/ হেক্টর, নিকেল ১১.৫৭ কিগ্রা/ হেক্টর এবং জিঙ্ক ২৩.১১ কিগ্রা/ হেক্টর। জলাভূমির তলদেশ থেকে কেবল তামা শোষণে কচুরিপানা সমর্থ হলেও জল থেকে উল্লেখিত দূষকগুলি কার্যকরীভাবে শোষিত

এরপর 3 পাতায়

পিছিয়ে নেই বাঙালিরা

2 পাতার পর

হয়। বর্জ্য জলের দূষণ নিরাময়ে কচুরিপানার ভূমিকা নিরূপনকরে গবেষকত্রয়ী পরিবেশ বিজ্ঞানে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন নিশ্চিত করে বলা যায়।

১০) যানবাহন সৃষ্ট শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে গাছের ভূমিকা ঃ গবেষক/গবেষিকা : দীপক ঘোষ, মধুমিতা ব্যানার্জী লাহিড়ি, অর্ঘ্য দেব, তড়িৎ গুহঠাকুরতা, রঞ্জন সেনগুপ্ত (স্যার সি.ভি. রমন সেন্টার ফর ফিজিক্স অ্যান্ড মিউজিক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়), আশিস মজুমদার (এন.এ.ই.বি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়), দেবাশিষ চক্রবর্ত্তী (প.ব. দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ)।

গবেষকরা কয়েক বছর ধরে কলকাতায় উল্লিখিত বিষয় নিয়ে গবেষণা চালিয়েছেন। তাঁরা দেখেছেন রাস্তার দু'পাশে গাছ লাগানো থাকলে শব্দের তীব্রতা ১০ ডেসিবল পর্যন্ত হ্রাস পায়।

১১) বেগুনের ফল ও কান্ডছিদ্রকারী পোকা দমনে ফেরোমোন ঃ

গবেষক : অরুনাভ চক্রবর্ত্তী ও প্রসেনজিৎ কুন্ডু, বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। মোহনপুর, নদীয়া। বেগুনের ফলন কম হওয়ার অন্যতম কারণ হল ফল ও কান্ড ছিদ্রকারী পোকা। এই পোকা দমনে চাষিরা প্রচুর রাসায়নিক কীটনাশক প্রয়োগ করেন। এর ফলে খাদ্যে বিষক্রিয়া, জৈব বিবর্ধন (Bismagnification) এবং পোকার কীটনাশক প্রতিরোধক্ষমতা বৃদ্ধি হয়। গবেষকরা লক্ষ্য করেছেন পোকাটি সারা বছর বেগুন ক্ষেতে থাকলেও এপ্রিলের শেষ সপ্তাহ থেকে জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত পোকাটির প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। ওঁদের গবেষণালব্ধ পর্যবেক্ষণ হল, পরিচ্ছন্ন চাষ (Clean Cultivation) পদ্ধতিতে বেগুনে কুঁড়ি আসার সময় একর প্রতি ২৫টি ফেরোমোন ফাঁদ (E11-16:AC ও E11-16:OH -এর মিশ্রণ) সংস্থাপন এবং ১০-১২ দিন অন্তর নিমতেল (2.0%) প্রয়োগ করে বেগুনের ফল ও কান্ড ছিদ্রকারী পোকার পরিমিত দমন সম্ভব।

১২) শিমুল বীজের ভৌত রাসায়নিক ধর্ম ও পুষ্টিগত মূল্য নির্ধারণ ঃ গবেষক : বিকাশ মন্ডল ও পলাশ রায়, রসায়ন বিভাগ, বিজয় নারায়ণ মহাবিদ্যালয়, ইটাকুন্ডা, হুগলী।

শিমুলের গুঁড়ো বীজ থেকে ২২.৬ শতাংশ হলদে তেল পাওয়া গেছে। এতে মাইরিস্টিক অ্যাসিড (2.2%), পামিটিক অ্যাসিড (24.8%), ওলেইক অ্যাসিড (64.8%) এবং লিনোলেইক অ্যাসিড (8.2%) উপস্থিত। গবেষকরা ১২ সপ্তাহ ধরে সাদা ইঁদুরকে 10% হারে শিমুল তেল খাইয়ে একই হারে বাদাম তেল খাওয়ানো ইঁদুরের রক্ত ও যকৃতে লিপিডের মাত্রা তুলনা করেছেন। তাঁরা দেখেছেন, উভয় ক্ষেত্রেই LDL ও HDL কোলেস্টেরল এবং ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা, টোটাল কোলেস্টেরল স্বাভাবিক থাকে। এছাড়া উভয় ক্ষেত্রেই বৃদ্ধি সময়ে হয়েছে। উভয় তেলের পাচ্যতা ও জৈবমূল্যও সমান। সুতরাং আগামী দিনে শিমুল তেলকে ভোজ্য তেল হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে তাঁরা স্বীকার করেছেন যে, শিমুল বীজের সংগ্রহের পরিমান বাণিজ্যিক ভাবে ব্যবহারের পক্ষে তেমন আশাব্যঞ্জক নয়।

১৩) গোল্ডফিসের রঙের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধিতে গাঁদাফুলের পাপড়ির প্রভাব ঃ গবেষক : আফরিন নাহার এবং তাপসকুমার ঘোষ, অ্যাকোয়াকালচার বিভাগ, মৎস্য বিজ্ঞান অনুষদ, পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, চকগাড়িয়া, কলকাতা-৯৪

অ্যাকোয়ারিয়ামের মাছ হিসেবে গোল্ডফিসের কদর সারা বিশ্বে অপরিসীম। এই রঙিন মাছের রঙ যত আকর্ষনীয় হয় ততই তার বাণিজ্যিক চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এজন্য বর্তমানে কৃত্রিম ক্যারটিনয়েড রঞ্জক খাবারের সাথে মিশিয়ে মাছেদের খাওয়ানো হয়। গবেষকরা দেখেছেন, বিট, গাজর ও গাঁদাফুলের পাপড়ি, যেগুলি ক্যারটিনয়েড রঞ্জক সমৃদ্ধ, গোল্ড ফিসকে খাওয়ালেও তাদের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পায়। কৃত্রিম রঞ্জক মেশানো খাবার খাওয়ানোর দিন থেকে মাছের রঙিন হয়ে উঠতে ৯০ দিন লাগে। তবে এক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ মাছই রঙিন হয়। অন্যদিকে গাজর ব্যবহারে ৬৬ শতাংশ মাছ ৭০ দিনে, ৭৫ শতাংশ মাছ ৮০ দিনে, ৮৫ শতাংশ মাছ ৯০ দিনে রঙিন হয়। আর গাঁদা ফুলের পাপড়ি ব্যবহারে ৬৫ শতাংশ মাছ ৭০ দিনে, ৮০ শতাংশ মাছ ৮০দিনে, ৯০ শতাংশ মাছ ৯০ দিনে রঙিন হয়। সুতরাং গোল্ডফিসের ঔজ্জ্বল্যকরণে গাঁদা ফুলের পাপড়ি ব্যবহার করলে বাণিজ্যিকভাবে সাশ্রয় হবে। তাছাড়া কৃত্রিম রঞ্জক মাছের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। গাঁদাফুলের পাপড়ি ব্যবহারে সেই ক্ষতি তো হয়ই না, বরং মাছের স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী।

১৪) পুরুষের প্রজনন নিরোধক হিসেবে কেশরদাম ঃ

গবেষক/গবেষিকা : শুভাশিস ঘোষাল, শুভময় ময়রা, ডঃ ইন্দ্রানী চক্রবর্ত্তী ও ডঃ নির্মল প্রধান। প্রেসিডেন্সি ইউনির্ভাসিটি, কলকাতা।

নিউ গিনির পাপুয়াতে গর্ভ নিরোধক হিসেবে কেশরদাম (*Jussiaca repens*)-এর পাতা ও কান্ড ব্যবহৃত হয়, এটি এদেশে বহুল প্রাপ্ত একটি জলজ উদ্ভিদ। গবেষকরা ইঁদুরের ওপর কেশর দামের শুকনো পাউডার ২৮ দিন ধরে প্রয়োগ করে দেখেছেন যে পুং ইঁদুরের প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। তাদের শুক্রানুর সংখ্যা ও শুক্রানুর বিচলন মান উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে, কিন্তু অন্য কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। সুতরাং এই গবেষণা আগামী দিনে পুরুষ বন্ধ্যাত্বকরণের কাজে কেশরদামের নির্যাস ব্যবহারের সম্ভাবনা উজ্জ্বল করেছে।

১৫) চায়ে রয়েছে ক্যান্সার নিরাময়ের চাবিকাঠি ঃ গবেষক/গবেষিকা : অর্ঘ্য অধিকারী, শুচিস্মিতা মোহান্তি ও অন্যান্য। মলিকুলার মেডিসিন বিভাগ, বসুবিজ্ঞানমন্দির, কলকাতা-৫৪

ক্যান্সার যে কতখানি ভয়াবহ মারণ রোগ তা সবারই জানা। ক্যান্সারের প্রচলিত ঔষুধগুলি ক্যান্সার আক্রান্ত কোষগুলির সাথে সুস্থ কোষকেও মেরে ফেলে। গবেষকরা দেখেছেন, চা-পাতায় উপস্থিত যৌগ থিয়াফ্ল্যাভিন ক্যান্সার কোষকে মারতে পারে, কোষের 'মেটাস্ট্যাসিস' বন্ধ করে ক্যান্সার ছড়ানো বন্ধ করতে পারে এবং টিউমারের প্রয়োজনীয় রক্তনালী তৈরিতে বাধা দেয়। এমনকি ঔষুধ প্রতিরোধী ক্যান্সারকেও থিয়াফ্ল্যাভিন সারিয়ে তোলে।

লেখক ঃ সৌম্যকান্তি জানা, কাকদ্বীপ (পূর্ব বাজার), দঃ ২৪ পরগনা। চলভাষ ঃ ৯৪৩৪৫৭০১৩০,
E-mail : janasoumyakanti@gmail.com

চোখ এর সমস্যা

1 পাতার পর

ন্যায় সিকি দর্শন। প্রাণী জগতের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে চোখ একটি অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। চোখ দিয়ে সৌন্দর্য বিচার থেকে আরও নানান কিছুর ব্যাখ্যা করা হয়। পটলচেরা চোখ, মৃগনয়না, কমলাক্ষী, রাজীবলোচন এই উপমাগুলি চোখের সৌন্দর্যের পরিচয় জ্ঞাপক। বস্তুতঃ অন্ধত্বের মত অভিশাপ আর কিছুতেই হয় না। কেননা চোখ না থাকলে আলোর অনুভূতিহীন জীবন লবণহীন ব্যঞ্জনের অনুরূপ।

কিন্তু নজরের প্রতি নজর দেওয়ার কথাটি আমরা প্রায় ভুলেই থাকি। সকালবেলায় মুখ ধোওয়ার সময় যেটুকু নজর দিই — বাকী সময় আর কই ? দরকার সচেতনতার। বললেই কেউ কেউ বলে উঠবেন — শুধু কি সময় — টাকা পয়সারও তো দরকার নাকি! দিনে দিনে মূল্যবৃদ্ধি, ঘরে, ঘরে বেকারত্বের অসহনীয় জ্বালা! সব সরিয়ে নজর পড়লো চোখের দিকে। এই চোখ রাঙানি সহ্য হয় না বাপু।

বলি কি টাকা পয়সা, বেকারত্ব, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি সবই সত্যি কিন্তু একটু চোখ খুলে তাকাতেই তো অসংখ্য জিনিসের দেখা মেলে যা দিয়ে অনায়াসেই চোখের সু-পরিচর্যা করা যায়। আমাদের চারপাশে প্রচুর গাছপালা আছে যারা আমাদের বিশেষ বন্ধু - চোখেরও; এদের সাহায্যেই চোখের বিশেষ যত্ন নেওয়া সম্ভবপর।

সত্যি বলতে কি আমাদের দেশ মোটামুটি গ্রীষ্মপ্রধান। সুতরাং অর্থ-বিত্তে যতই আমরা বঞ্চিত হই না কেন, সূর্যের আলোর প্রাচুর্য আমাদের আছে। এর উপরে উপরি পাওনা আমাদের ভ্রমণ স্পৃহা। সেখানে গিয়ে অনেকেই সারাদিন কাটিয়ে দেন সাগরবেলায় ফলে সারাদিনই প্রচুর সূর্যালোকের মধ্যে কেটে যায়। আর সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মির হাত থেকে বাঁচার জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে সাবধানতা অবলম্বনের আমোদ-প্রমোদ যেমন দরকার - কিন্তু তারও আগে দরকার চোখের স্বাস্থ্য পরীক্ষার।

একদম প্রথমেই দরকার গ্রীষ্মে নিজের জীবনযাত্রাকে সংযত রাখা। গ্রীষ্ম এবং শীত উভয়ের মধ্যে এত ফারাক প্রত্যেক দিনের খাওয়া দাওয়ার বিষয়েও অনুরূপ পরিবর্তন থাকা উচিত। গ্রীষ্মের পক্ষে উপকারী খাদ্য তালিকায় প্রচুর শাক-সব্জী, গাজর, মেটে, কড লিভার তেল, বাদাম এবং আরও এই জাতীয় খাবার থাকলে প্রখর সূর্যকিরণের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সহজেই চোখকে রক্ষা করা সম্ভব। আর এই সময়ে একবার করে চোখ দেখানো খুবই ভালো অভ্যাস।

বিশেষত ঃ গ্রীষ্মকালে কয়েকটি সাধারণ চোখের রোগের আধিক্য দেখা যায়। এগুলি সম্পর্কে এবং এর নিরাময়ের জন্য গাছ-গাছড়ার সাহায্য নিয়ে অনায়াসেই আমরা ভেষজ চিকিৎসা করতে সক্ষম।

চক্ষুর প্রদাহ (কনজাংটিভাইটিস) ঃ চোখের মধ্যেকার জলীয় অংশের উপরে যে স্বচ্ছ পর্দাটি চোখের মনির উপরে ঢাকবার মত বিরাজ করছে সেইটি হল কনজংটিভা।

এই রোগ থেকে দূরে থাকার জন্য প্রচুর জলপান এবং টাটকা শাক-সব্জীর ক্বাথ (জলে সিদ্ধ করে প্রস্তুত করে ঘন নির্যাস অংশ) পান করতে হবে। এই রোগের সব থেকে উপকারী সব্জী হল পালং এবং গাজর। ২০০ মি.গ্রা. ৩০০মি.গ্রা. গাজরের ক্বাথ বা নির্যাস মিশ্রণ করে রোজ খেলে চোখ লাল হওয়ার রোগ থেকে স্বস্তি পাওয়া যাবে।

এক কাপ গুজবেরী (টেপারী ফল) এবং ২ চামচ মধুর মিশ্রণ দিনে ২ বার খেতে হবে। মধু হল বিভিন্ন রোগের উপশমকারী উপাদান। এটি রক্তশোধন সহায়ক এবং বিভিন্ন রোগের জীবাণু ও বীজানুকে ধ্বংস করে যারা কনজাংটিভাইটিস রোগের অন্যতম সহায়ক।

ধনের চা দিয়ে আক্রান্ত চোখ ধুয়ে ফেলা খুবই উপকারী। দু-কাপ জল গরম করে উনুন থেকে নামিয়ে এক কাপ শুকনো ধনে ঐ জলে দিয়ে পাঁচ মিনিট রেখে দিতে হবে। এবার ছেঁকে নিয়ে তরল অংশটি স্বাভাবিক তাপমাত্রায় এনে ঐ তরলটি দিয়ে চোখ ধুয়ে ফেলতে হবে। এতে প্রদাহের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি ও রোগের উপশম দুই-ই হবে।

বাবলু ও কনজাংটিভাইটিসের চিকিৎসা করতে পারে। বাবুল পাতার মলম (পেস্ট) রাতে ঘুমোবার আগে মেখে শুতে হবে। এতে চোখের করকরানি, জলপড়া এবং লালভাব,কেটে যাবে এবং যন্ত্রণার উপশম ও প্রদাহ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

ক্যালেন্ডুলার ক্বাথ দিয়েও চোখ ধুলে যন্ত্রণার উপশম হবে এবং আক্রান্ত তোখকে ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করবে।

কিছু নিমপাতা ডলে জলে মিশিয়ে ক্বাথ তৈরী করে একটা পাতলা ও পরিষ্কার কাপেতে নিয়ে আক্রান্ত চোখের উপরে রাখতে হবে। এই জলকে সামান্য গরম করে আক্রান্ত চোখের বিপরীত দিকের কর্ণকুহরে বা কর্ণগহ্বরে দু-এক ফোঁটা দিলে স্বস্তি পাওয়া যাবে। কয়েকবার করলেই চোখ ভালো হয়ে যাবে। ত্রিফলার লোশন (মলম) সাধারণত চোখের রোগের ক্ষেত্রে ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়। ত্রিফলা তিন-ধরণের ফলের মিশ্রণ (আমলকি, হরিতকী, বহেড়া) এবং ভারতীয় গুজবেরী। এর চূর্ণ জলে ভিজিয়ে আধ ঘন্টা রাখার পর এই লোশন তৈরী হয়ে যাবে। এই লোশন দিয়ে দিনে ৩ বার চারবার চোখ ধুয়ে ফেলতে হবে। ত্রিফলার এই লোশন কনজাংটিভাইটিস এবং ছানির ক্ষেত্রেও বিশেষ উপযোগি। ত্রিফলা ভেজানো জল দিয়ে রোজ চোখ ধুলে চোখের স্বাস্থ্য ভালো থাকবেই।

চোখের আর একটি সাধারণ রোগের নাম হল আঞ্জনী।

চোখের পাতার উপর ছোট ছোট ফোঁড়াকে আঞ্জনী বলে। এটা হল চোখের পাতায় যে লোম থাকে তার থেকে সংক্রামিত একটি সাধারণ রাগ যা প্রায়ই চোখের নীচে ফোঁড়া বা ব্রন এর সদৃশ যা চোখের পাতার লোমগুলিকে নোংরা পুঁজের মাধ্যমে আটকে রেখে দেয় ও স্পর্শ মাত্র সেখানে যন্ত্রণার সৃষ্টি করে।

এক চামচ ধনে এক কাপ জল গরম করে ভেষজ চা বানিয়ে তিন থেকে চারবার দিতে হবে।

এক মুঠো (এ্যাকেশিয়া) বাবলা জাতীয় গাছের পাতা দু-কাপ জলে গরম করতে হবে। ফুটিয়ে ক্বাথ তৈরী করতে হবে ও ঐ ক্বাথ চোখের পাতায় সেঁক দিতে হবে। এটি ফোলা ভাবকে কমাবে এবং যন্ত্রণা ও আঞ্জনীর হাত থেকে রক্ষা করবে।

এক চামচ হলুদ দু-কাপ জলে গুলে গরম করে অর্ধেক করতে হবে। ঠান্ডা হলে এটি ভালো মসলিন কাপড়ে ছেঁকে নিতে হবে। দিনে তিন-

এরপর 9 পাতায়

জলাভূমির জীবন দর্শনঃ একটি সমীক্ষা

২০০১ সালের অগাষ্ট মাসে সুপ্রিম কোর্ট জানায় পুকুর বা জলাশয় ভরাট করা যাবে না। জলাশয় সংরক্ষণে ৯টি আইন রাজ্যের হাতে রয়েছে, অথচ সর্বত্র বিপন্ন জলাশয়। জলাশয় সংরক্ষণে ৯টি আইন উল্লেখ করা হল ঃ—

নাম	বিষয়
১) বঙ্গীয় কচুরিপানা আইন '৩৬	কচুরিপানায় পুকুর নষ্ট করা যাবে না।
২) বঙ্গীয় পুকুর উন্নয়ন আইন '৩৯	পুকুরের জল দূষিত হলে ব্যবস্থা গ্রহণ ও অধিগ্রহণ।
৩) পঃবঃ জলাশয় সংরক্ষণ ব্যবহার আইন '৫২	মজে বা বুজে যাওয়া পুকুর অধিগ্রহণ।
৪) জল দূষণ ও প্রতিরোধ আইন '৭৪	জলাশয় বাঁচাতে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্যদকে ক্ষমতা।
৫) পুকুর অধিগ্রহণ ও সেচের অধিকার আইন '৭৬	সেচের কাজের জন্য পুকুর সংরক্ষণ ও অধিগ্রহণ।
৬) কলকাতা পুরসভা আইন '৮০	পুকুর নোংরা করলে সাজা হবে।
৭) নদী ও পুকুরে (জলাশয়ে) মৎস্য চাষ আইন '৮৪	মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ ও জলাশয় সংরক্ষণ
৮) পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইন '৫৫	জলাশয় রক্ষণাবেক্ষণ, জলাশয়ের চরিত্র বদল করা যাবে না।
৯) নদী ও পুকুরে মৎস্য চাষের সংশোধিত আইন '৯৩	পুকুরপাড় সহ ৫ কাঠা (০.০৩৫ হেক্টর) বা তার বেশি মাপের কোন শ্রেণীভুক্ত পুকুর, ডোবা, জলাশয় ভরাট করা যাবে না। এই আইনের ধারাগুলি লঙ্ঘন করলে জামিন অযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে।

১৫টি জলাশয় সমীক্ষা

কোচবিহার পৌরসভা ও লাগোয়া পঞ্চায়েত এলাকায় গত ১ বছর ধরে জলাশয় (দিঘি) গুলির পরিবেশ ও দূষণ চিত্র নিয়ে কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরামের উদ্যোগে এক সমীক্ষা চালানো হয়। কোচবিহারের রাজারা পানীয় জল, মৎস্য চাষ ও অগ্নিকান্ড মোকাবিলা সহ পরিবেশ নির্মল ও দূষণমুক্ত রাখার জন্য ৩৪টি বড় বড় দিঘি খনন করেছিলেন। এর মধ্যে ১৫টি জলাশয়ের (দিঘির) সমীক্ষা ও বিবরণ —

দিঘির নাম ও দিঘির পরিবেশ সমীক্ষার বিবরণ

১) সাগর দিঘি ঃ— স্নান করা ও কাপড়কাচা হয়, জলদূষিত, পরিযায়ী পাখি বর্তমানে অনেক কম আসে, নোংরা আর্বজনা জলে মেশে। শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত। সবচেয়ে বৃহৎ আয়তনের দীঘি।

২) সাঁওতাল দিঘি ঃ— এন.এন রোডে অবস্থিত। চারিদিকে বাড়ী, দোকান, সব ধরণের নোংরা আবর্জনা মলমূত্র দিঘিতে মেশে। জল ভীষণভাবে দূষিত।

৩) শিবদিঘি ঃ— কচুরিপানা, আবর্জনা ও নোংরাসহ প্রায় ভরাট, জল দূষিত।

৪) চন্দন দিঘি ঃ— উত্তরে মুখ্য ডাকঘর, দক্ষিণে সরকারি স্কুল ও কলেজ, পূর্বে হোস্টেল, পশ্চিমে জেলা হাসপাতাল। নোংরা, আবর্জনা কচুরিপানা সহ ভর্তি, জলদূষিত ও গন্ধযুক্ত। ভরাট হয়ে যাচ্ছে।

চন্দন দিঘী, কোচবিহার ছবি ঃ লেখক

মরাতোর্ষা নদী (খাল), কোচবিহার ছবি ঃ লেখক

এরপর 12 পাতায়

জাপানে দুধে তেজস্ক্রিয়

1 পাতার পর

তেজস্ক্রিয় এলাকা বলে ঘোষিত হয়। চুল্লির তেজস্ক্রিয় জল সমুদ্রে পড়ায় আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলের জলে তেজস্ক্রিয়তা ধরা পড়ে। চীন ও দক্ষিণ কোরিয়া জাপানের রপ্তানি দ্রব্য নিষিদ্ধ হয়। ভারত সরকার ও কিছুদিনের জন্য নিষিদ্ধ করেছিলেন। পরে তা প্রত্যাহৃত হয়। জাপানী জাহাজ অন্য দেশে পণ্য নিয়ে যাওয়ার জন্য জাহাজে সমুদ্রের জল নিয়ে যায়। অন্য দেশের বন্দরে সেই জল ফেলে দিয়ে জাহাজে অনেক মাল তোলে। জাপানের সমুদ্রের জলে তেজস্ক্রিয়তার জন্য চীনে ও দক্ষিণ কোরিয়ার বন্দরগুলিতে জাপানি জাহাজের জল ফেলা এখনও নিষিদ্ধ। ভারতের গোয়া বন্দরেও জল ফেলা নিষিদ্ধ। কিন্তু চেন্নাই বন্দরে জাপানী জাহাজের জল ফেলা নিষিদ্ধ হয়নি।

জাপানের সংবাদ মাধ্যমে ফুকুশিমায় দূর্ঘটনার পর তেজস্ক্রিয়তা ছড়ানোর কোনো খবরই এখন প্রচারিত হচ্ছে না। জাপানের পার্লামেন্টে পরমানু পৃষ্ঠপোষকেরা খুবই শক্তিশালী। এই সঙ্গে আছে পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী টোকিও ইলেকট্রিক কোম্পানী এবং আমেরিকার চাপ। জাপানের পারমানবিক চুল্লিগুলি মার্কিন কোম্পানীর তৈরি। তাদের তৈরি চুল্লিগুলির জন্য জাপানে এত বড় দূর্ঘটনা হল, এটা বেশী মাত্রায় প্রচারিত হলে পারমানবিক চুল্লির বাজার তো যাবেই, চুল্লি প্রস্তুতকারী কোম্পানীকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবিও উঠতে পারে। পারমানবিক লবির চাপে জাপানের পিপলস পার্টির দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী কানোকে পদত্যাগ করতে হয়, ঐ দলের আর এক নেতা এখন প্রধানমন্ত্রী। তিনিও তেজস্ক্রিয়তা ছড়ানো ও অন্যান্য কুফল-জনিত সংবাদ প্রচারের বিপক্ষে। বিদেশী সাংবাদিক ও বিদেশী পরমাণু বিজ্ঞানীদের জন্য জাপানের তেজস্ক্রিয়-জনিত সংবাদ বিদেশের লোক জানতে পারছে, জাপানের লোকেরা জানতে পারে না। এমন কথা শুনিয়ে গেলেন শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র মুসায়িকী অনিশি গত নভেম্বরে কলকাতা এসে। ফুকুশিমা থেকে ১৪০ কিমি দূরে টোকিও শহরেও তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে পড়েছে। অনিশির মতে, প্রায় দশ লক্ষ লোক তেজস্ক্রিয়তায় আক্রান্ত। শিশু ও কিশোরদের জন্য চিন্তা। এত লোকের চিকিৎসাও হবে কী করে? স্বচ্ছল জাপানিরা বিদেশে চলে যাচ্ছে। অনিশির স্ত্রী ও দুই ছেলে এখন অস্ট্রেলিয়ায়, অনিশিও জানুয়ারিতে অস্ট্রেলিয়া চলে যাবে।

—ঃ শিশুদের গুড়ো দুধে তেজস্ক্রিয়তা ঃ—

হঠাৎ গত ৬ ডিসেম্বর জাপানে মেইজি হোল্ডিং কোম্পানীর বাজার থেকে গুড়ো দুধ ফিরিয়ে নেওয়ার খবর বোম্ব-শেলের মতো কাজ করেছে। শিশুদের দুধে তেজস্ক্রিয় সেশিয়ান পাওয়া গিয়েছে। তাই কোম্পানী ৪ লক্ষ দুধের টিন বাজার থেকে ফিরিয়ে নিয়েছে। এই খবর প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে টোকিও শেয়ার বাজারে মেইজি কোম্পানীর শেয়ার দশ শতাংশে নেমে এসেছে। হয়ত শেয়ার মার্কেটে মেইজি কোম্পানীর শেয়ারের দাম এক দশমাংশে নেমে আসায় দুধে তেজস্ক্রিয় সেশিয়ান পাওয়ার ঘটনা চেপে রাখা যায়নি। মেইজি কোম্পানির ঘোষণার পর সব্জি, দুধ, চা, সমুদ্রের মাছ ও অন্য খাদ্যদ্রব্য এবং জলে তেজস্ক্রিয় পদার্থের অস্তিত্ব নিয়ে লোকে ভয় পেয়েছে। এইসব সব্জি ও খাদ্যদ্রব্যে অতিরিক্ত তেজস্ক্রিয় পদার্থের অস্তিত্ব নিয়ে লোকের আগেই আশঙ্কা ছিল। কিন্তু সরকার বলেছিলেন, তেজস্ক্রিয় নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আছে। সুতরাং ভয়ের কিছু নেই। এসোসিয়েটেড প্রেসের পাঠানো খবর এখন টাইমস অব ইন্ডিয়া ৭ ডিসেম্বর ছেপেছে বলে আমরা জাপানে দুধে তেজস্ক্রিয়তার কথা জানতে পারছি।

মেইজি কোম্পানী জানিয়েছে, তাদের দুধে কী ভাবে তেজস্ক্রিয় সেশিয়ান ঢুকলো তা তারা বুঝতে পারছে না। সেশিয়াম হচ্ছে নরম, সোনা-রূপোর মতো আলকোলি পদার্থ। ২৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে গলে যায়। পরমাণু চুল্লি থেকে নিগত বর্জ্য পদার্থ থেকে সেয়িশান ১৩৭ বিচ্ছিন্ন করা হয়। ফুকুশিমার পারমানবিক কেন্দ্রে দূর্ঘটনা থেকে তেজস্ক্রিয় পদার্থ কীভাবে দুধে ঢুকল। মেইজি কোম্পানী তা বুঝতে পারছে না। কোম্পানির এক মুখপত্র বলেছেন, দুধের তরল অংশ দূর করার জন্য যে গরম বাতাস ব্যবহার করা হয়েছিল, সেই বাতাসে তেজস্ক্রিয় পদার্থ থাকতে পারে। পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে প্রতি এক কিলো গুড়ো দুধে ৩০৮ বিকুরেলস সেশিয়ান আছে। একই খবরে জানা গেল ১১ মার্চের ঘটনার পর থেকে পারমানবিক কেন্দ্র থেকে নির্গত তেজস্ক্রিয়তা বাতাসে মিশে যাওয়াকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা অব্যাহত আছে। অর্থাৎ এখন ফুকুশিমার আশেপাশের লোকেরা নিরাপদ নয়।

৭ ডিসেম্বর টোকিও থেকে পাঠানো অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের খবর খুবই ছোট করে দ্য স্টেটসম্যান ছেপেছে ৮ ডিসেম্বর। সেটি হচ্ছে ফুকুলের মিহিমা নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টের ২ নম্বর চুল্লিতে ঠান্ডা জলের ভালভ সমস্যা সৃষ্টি করায় অনির্দিষ্টকালের জন্য ঐ চুল্লিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ। এই পারমানবিক কেন্দ্রের পরিচালক কানসাই ইলেকট্রিক পাওয়ার কোম্পানি ঐ ঘোষণা করেছে। এই চুল্লিতে বিদ্যুৎ উপাদান বন্ধ হওয়ায় বর্তমানে জাপানে মাত্র ৮টি কেন্দ্রে পারমানবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন চালু থাকছে।

এই খবরের আগে লন্ডনের সাপ্তাহিক ইকনমিস্ট একটা খবর ছেপেছে। ফুকুশিমার তেজস্ক্রিয় এলাকার ২০ কিলোমিটার এলাকার বাসিন্দা বর্তমানে ক্যাম্পে থাকেন। তিনি ইকনমিস্ট পত্রিকার প্রতিনিধিকে গোপনে ফুকুশিমার কাছে নিয়ে যান। দু'জনের শরীরে ছিল তেজস্ক্রিয়তা প্রতিরোধের পোশাক। তেজস্ক্রিয় এলাকা থেকে সরিয়ে আনা জনগোষ্ঠীর ৮৯ হাজার এখনও ক্যাম্পে আছেন। নিজেদের বাড়িতে ফেরার অনিশ্চয়তা তাদের অস্থির করে তুলেছে। তাঁদের আশঙ্কা তারা আর কখনও নিজের নিজের বাড়িতে ফিরতে পারবেন কিনা। ফুকুশিমার পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে তেজস্ক্রিয় আবর্জনা যাঁরা সরাচ্ছেন তাঁরা কেউ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কর্মী নন। তাঁরা সকলেই অস্থায়ী শ্রমিক। বেশী মজুরির লোভে এই বিপজ্জনক কাজ করছেন। এই কর্মীরা সকলেই বোরাকু। যারা জাপানি সমাজে অচ্ছুত। এদের পূর্ব পুরুষদের কোরিয়া থেকে ধরে আনা হয়েছিল। পারমানবিক কেন্দ্রের এক ইঞ্জিনিয়ার দায়িত্ববোধের তাগিদে ঐ কর্মীদের কাজের তদারকি করছেন।

জাপানে মোট বিদ্যুতের এক তৃতীয়াংশ বিদ্যুৎ আসত পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে। এই প্রথম শীতের মধ্যে জাপানের অধিবাসীরা টের পাচ্ছেন বিদ্যুতের অভাবের ঘটনা। তার থেকেও তাদের বড় চিন্তা যে আনুমানিক দশ লোক তেজস্ক্রিয়তায় আক্রান্ত, তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য চিকিৎসার খরচও বহন করা হবে কী ভাবে?

লেখক ঃ নিরঞ্জন হালদার, ৬৫১ যোগেন্দ্র গার্ডেন, কলকাতা-৭০০১০৭

সংখ্যায় ছন্দ, বেজায় আনন্দ

অনেক অনেক সংখ্যা আছে যেগুলি তাদের ভেতরের অঙ্কগুলির সঙ্গে মিল রাখে। আর এই মিল পাওয়া যায়। কিছু গাণিতিক প্রক্রিয়ার সঠিক প্রয়োগ দ্বারা। নীচের উদাহরণগুলির সাহায্যে তা দেখান হল।

কখনও কখনও দুটি সংখ্যার বর্গের যোগফল, আবার কখনও বা দুটি সংখ্যার যোগফলের বর্গমান উত্তরের মধ্যেই তাদের রূপ খোঁজে। যেমন—

$1233=12^2+33^2$; $8833 = 88^2+33^2$

$10100 = 10^2+100^2$; $13467= 134^2+67^2$

$81=(8+1)^2$; $2025= (20+25)^2$; $3025=(30+25)^2$

$88209=(88+209)^2$; $60481729=(6048+1729)^2$

$52881984=(5288+1984)^2$

না, এতেই শেষ নয়, দুটি সংখ্যার বর্গের অন্তরও মিল এনে দেয়, যাতে মূল সংখ্যা উল্টো ভাবে উঁকি দেয়।

$48=8^2 - 4^2$

$3468=68^2 - 34^2$

$34188=188^2 - 34^2$

পরপর চারটি সংখ্যা যোগ করলেই ফল ঃ

$(11^2+13^2) - (10^2+12^2) = (10+11+12+13) = 46$

$(12^2+14^2) - (11^2 + 13^2) = (11+12+13+14)=50$

ভিন্ন উপায়ে মিল আনা ঃ কখনও বা একটি অঙ্কের বর্গমান এবং অন্য অঙ্কের ঘনমানের যোগফল অঙ্কগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখে। ফ্যাকটোরিয়াল চিহ্নের সাহায্য নিয়েও এইরকম মিল আনা যায়।

$63 = 6^2+3^3$

$145 = 1!+4!+5!$

তিনটি অঙ্কের ঘনমানের যোগফলও কখনও বা মূল সংখ্যাকে খুঁজে আনে।

$153 =1^3+5^3+3^3$

$370 = 3^3+7^3+0^3$

$371 = 3^3+7^3+1^3$

শুধু তিন অঙ্কের নয়, বেশি অঙ্কের সংখ্যার মধ্যে এই ছবি দেখা যায়। ত্রিঘাত বা তার বেশি ঘাতের সাহায্যে এই মিল আনা যায়।

$41833=4^3+18^3+33^3$

$221859 = 22^3+18^3+59^3$

$1634 = 1^4+6^4+3^4+4^4$

$54748 = 5^5+4^5+7^5+4^5+8^5$

$548834 = 5^6+4^6+8^6+8^6+3^6+4^6$

$1741725 = 1^7+7^7+4^7+1^7+7^7+2^5+5^7$ (Markov no)

এছাড়া চারটি অঙ্কের যোগফলের ঘনমানও এমন মিলকে খুঁজে আনে।

$4913=(4+9+1+3)^3$

পাশাপাশি বা নির্দিষ্ট পার্থক্যের সংখ্যার খোঁজে ঃ বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় দুই অঙ্কের পরপর সংখ্যা বা অন্য পার্থক্যের সংখ্যা পাশাপাশি আনা যায়।

$6^5 = 77, 76$

$91^2 = 8281$

$26x66=1716$

$12^3-12=1716$

$11^2x8^2=88^2=7744$

$88^2+33^2=8833$

$22^3-13^3-9^3=7722$

$10^3+12^3=2728$

$54 x 58=3132$

$3^3+4^3+12^3=1819$

$7845 x99= 776655$

$887766550 \div 11= 80706050$

$80706050 \div 5 = 16141210$

$1126x112=126112$ (শুধু 1 বাদ)

এইভাবে বিভিন্ন ধরণের ছন্দের খোঁজ পাওয়া থেকে পারে অসংখ্য সংখ্যার মধ্যে। এই প্রসঙ্গে গণিতাঙ্কের যুবপদ বলে খ্যাত কার্ল গাউসের উক্তিটি স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন বিমানের রানী হল গণিত আর সংখ্যাতত্ত্ব হল গণিতের রানী।

লেখকঃ কমল কুমার চক্রবর্তী, B-25/4, Kalindi Housing State, Kolkata-700089, Ph.- 033-65006325

রিপোর্ট ঃ ১ বিজ্ঞান সম্মেলন

৪ মার্চ কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরামের ষষ্ঠ বার্ষিক সম্মেলন কোচবিহার শালবাগানে অনুষ্ঠিত হল। সম্পাদক শেখর ঘোষ প্রতিবেদন পেশ করে বলেন, স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সারা বছর ধরে বিজ্ঞান মনস্কতা প্রসারের কাজ চালিয়ে যাওয়া হয়েছে, পাশাপাশি পরিবেশ ও বিজ্ঞান ভাবনা নিয়ে সমীক্ষা আলোচনা সভা ও পত্রিকা প্রচারের কাজ করা হয়েছে। বিজ্ঞান কর্মী জয়দেব দে বলেন, জেলা জুড়ে সারা বছর ধরে বিজ্ঞান চেতনা প্রসারের কাজ সর্বস্তরে চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কলকাতা চেতলা গণবিজ্ঞান কেন্দ্রের অনুরুদ্ধ ভট্টাচার্য্য বিজ্ঞান ভাবনার বিভিন্ন কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা করেন, বিজ্ঞান পত্রিকা 'বিজ্ঞান বার্তা'র উল্লেখ করেন। সম্মেলনে তপন চন্দ, শংকর নারায়ণ দাস, প্রদীপ কৈরী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সম্মেলনে আগামী ১ বছরে জন্য ১০ দফা কর্মসূচী গৃহীত হয় এবং সভাপতি সম্পাদক যথাক্রমে ড. অমিতাভ চক্রবর্ত্তী ও শেখর ঘোষ মনোনীত হন।

রিপোর্ট ঃ ২ ফুকুশিমা দিবস উদ্‌যাপন

১১ মার্চ বিজ্ঞান দরবারের উদ্যোগে জাপানের ফুকুশিমা পরমাণু চুল্লির বিপর্যয়—ভয়াবহ ভাবে কয়েক হাজার মানুষ মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপন করা হয় এবং পাশাপাশি দিনটিকে ফুকুশিমা দিবস হিসাবে পালন করা হয়।

বিজ্ঞান দরবারের পক্ষ থেকে ঐ দিন 'ফুকুশিমা : অতঃকিম' শীর্ষক প্রচারপত্র প্রকাশ করা হয়, কাঁচরাপাড়া স্টেশনে পরমাণু চুল্লির বিপদজনক দিকগুলি নিয়ে, পাশাপাশি বিকল্প শক্তির উৎস নিয়ে প্রচার চালানো হয়।

সংবাদদাতা

হিউম্যান প্রোটিওম অরগানাইজেশন

হিউম্যান জিনোম মানচিত্র তৈরির হিড়িকের পাশাপাশি জীববিজ্ঞানীরা এখন জীবদেহের সমস্ত জিনের সমষ্টি—জিনোমের বদলে দেহে উপস্থিত প্রোটিন সম্ভার বা 'প্রোটিওম' এর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন— রহস্যময় প্রোটিনকে জানতে। হিউম্যান জিনোম প্রকল্পে নিযুক্ত বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে মানব শরীরে ৮০,০০০ থেকে ১,০০,০০০ জিন পাওয়া যাবে যা মানুষের প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী। বাস্তবে, মানব দেহে মাত্র ৩০,০০০ জিনের সম্ভার পাওয়া গেছে — যেটা সকল প্রকার মানব চারিত্রিক বৈশিষ্ঠ্যের জন্য দায়ী। এমনিতেই মাছির দেহে প্রাপ্ত জিনের সংখ্যা ১৩,৫০০ কৃমির দেহে ১৯,০০০ এবং সরষে গাছে ২৫,০০০। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন চলে আসে মানুষের মতো উন্নত প্রজাতির প্রাণীর দেহে এত অল্প সংখ্যক জিনের উপস্থিতি ঘিরে।

প্রত্যেকটি বহুকোশী জীবের মতো মানুষও তৈরি হয়েছে অসংখ্য কোষ দিয়ে যাদের সংখ্যা ১০০,০০০,০০০,০০০,০০০ =১ লক্ষ কোটি। এদের মধ্যে শুধুমাত্র পরিণত লোহিত কণিকা এবংঅনুচক্রিকা বাদে প্রায় প্রতিটি কোশের মধ্যে উপস্থিত নিউক্লিয়াসের মধ্যেকার ২৩ জোড়া বা ৪৬টি ক্রোমোজোমের ২৩টি আসে পিতা ও ২৩টি আসে মাতা থেকে (ব্যতিক্রম শুক্রানু ও ডিম্বানুকোষ)। ক্রোমোজোমের মূল উপাদানই হল ডি-অক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড বা ডি.এন.এ। এই ডি.এন.এ তন্তু শক্তি ভাবে প্যাঁচানো বা মোচরানো মই এর মত। এক একটা ডি.এন.এ তন্তু প্যাঁচ খোলা অবস্থায় ৫ ফুটেরও বেশি হয় দৈর্ঘ্যে। এক একটা ডি.এন.এ তন্তুতে ৩০,০০০ এর মতো জিন রয়েছে (পূর্বে অনুমান ছিল ৮০,০০০ — ১ লক্ষ) যা আসে ডি-অক্সিরাইবোজ সুগার, ফসফেট ও নাইট্রোজেনযুক্ত ক্ষারকের সমন্বয়ে তৈরি নিউক্লিয়টাইডের এক একটি নির্দিষ্ট কার্যকরী সজ্জারীতি। আসলে, ওই 'জিন'ই হল ডি.এন.এ এর দৈর্ঘ্য বরাবর খানিকটা অংশ বিশেষ। এই ডি.এন.একে যদি এ.টি.সি. ও জি (A. T. C & G.) এই চারটি অক্ষরে লেখা একটা ভাষার সাথে তুলনা করা যায় তাহলে তাদের মধ্যেকার তিনটিকে একত্রে অর্থাৎ (C.G.A.) ইত্যাদি হল ঐ ভাষার এক-একটি শব্দ। আর এই হিসেবে এরকম শব্দ সংখ্যা দাঁড়ায় মোট ৬৪টি। কাজের ক্ষেত্রে আবার ঐ ৬৪টি শব্দের মধ্যে বেশির ভাগেরই অর্থ এক। এই হিসেবে অর্থ পার্থক্য করলে আসলে অর্থবহ শব্দ সংখ্যা দাঁড়ায় ২০টি।

এদিকে ডি.এন.এ এর মূল দায়িত্বই হল প্রোটিন উৎপাদন যার মূল উপাদান হল ২০টি বিভিন্ন ধরণের অ্যামাইনো অ্যাসিড। ডি.এন.এ ভাষায় ঐ তিন অক্ষরের শব্দগুলো পরপর জুড়ে গিয়ে নির্দিষ্ট অ্যামাইনো অ্যাসিডের সজ্জাক্রমকে নির্ধারণ করে যা বিভিন্ন প্রকার প্রোটিন তৈরির জন্য জরুরী। বস্তুত পক্ষে জীবকে বাঁচতে হলে কোষে কোষে সবসময় প্রোটিন উৎপাদন অত্যন্ত জরুরী।

জিনে আঁকা থাকে শুধুমাত্র প্রোটিন সৃষ্টির নীল নকশা। (Blue Print) এই নকশা অনুযায়ী দেহের কোষগুলির প্রোটিনের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি জিনের নির্দেশে সুনির্দিষ্ট রীতিতে সাজিয়ে নেয়। এতে তৈরি হয় পলি পেপটাইড শৃঙ্খল (Polypeptide Chain) পরে নানান ভাবে ভাঁজ হয়ে বিচিত্র রূপ ধারণ করে — গঠন করে বিভিন্ন প্রকার প্রোটিন। আর এই বিভিন্ন ধরণের প্রোটিন অণু কী আগের ধারণ করবে বা কে কার সঙ্গে জোড়া লাগবে তা নিয়ন্ত্রণ করার সামর্থ্য নেই জিনের। তাই জিন নয়, মানব দেহে যেকোন কাজের নিয়ন্ত্রক প্রোটিন। এই প্রোটিনের জন্যই দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে শরীর সুস্থ থাকে— একদিকে আবার এই প্রোটিনের গোলযোগের জন্যই ক্যান্সারের মতো ভয়ঙ্কর রোগের জন্ম। আসলে হরমোনই হোক বা উৎসেচক; অ্যান্টিবডিই হোক অথবা ক্যান্সার কোষ—উৎস একটাই তাহল প্রোটিন — প্রোটিন্ বিজ্ঞানীদের অন্তত: তাই ধারণা।

প্রোটিন বিজ্ঞানীদের মতে, জিন সমষ্টিকে চিহ্নিত করা মানব দেহের রহস্য উদ্‌ঘাটনে প্রাথমিক ধাপ। জটিল এই মানব শরীরে ঘটে যাওয়া বিচিত্র ঘটনার মূল কারিগর বৈচিত্র্যময় প্রোটিন সম্ভার।

আধুনিক শতাব্দীতে তাই চিকিৎসা বিজ্ঞানের মূল লক্ষ্যই হল— মানব দেহের প্রোটিন সমষ্টি বা 'প্রোটিওম' কে চিহ্নিত ও বিশ্লেষণ করা।

বৈচিত্র্যের দিক থেকে 'জিন' ও 'প্রোটিন' এর মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। মানুষের যে কোন অঙ্গ যেমন যকৃৎ, চুল, নখ, রন্ধ্র প্রভৃতি থেকে 'ডিএনএ' এর নমুনা সংগ্রহ করলে প্রতিটি অণুই একই রকম বলে মনে হবে। কিন্তু শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে প্রোটিন অণু নিয়ে তুলনামূলক পরীক্ষা করলে বৈচিত্র অধিক পরিমাণে লক্ষ্য করা যাবে।জিনোম প্রজেক্টের বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল এক একটি জিন একটি মাত্র প্রোটিন তৈরি করে যা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। এখন জানা যাচ্ছে যে, একটি মাত্র জিন নানান ধরণের প্রোটিন তৈরি করতে পারে এবং তৈরি হওয়া প্রতিটি প্রোটিনগুলির চরিত্র অনেকটাই স্বতন্ত্র।

নির্দিষ্ট একটি প্রোটিন তৈরির নির্দেশ আসে জিনের কাছ থেকে। বার্তাবহ আরএনএ (এমআরএনএ) সেই নির্দেশ অনুযায়ী কোশের রাইবোজোমে অ্যামাইনো অ্যাসিড তৈরি করে। এই কাজে বাহক আরএনএ (টিআরএনএ) সহযোগী হিসেবে কাজ করে। ২০ রকমের অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে বাছাই করে বাহক আরএনএ এক-একটি পলিপেপটাইডের শৃঙ্খল তৈরি করে। এই শৃঙ্খলগুলির উপর আর জিনের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না সাধারণ ভাবে। পলিপেপটাইডগুলি বিভিন্ন আকার ধারণ করতে পারে এই সময়। এছাড়া অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য যেমন গ্লুকোজ, ফসফেট বা হাইড্রোক্সিল এর সঙ্গে মিশে নানান ধরণের চেহারা নিতে থাকে। বিভিন্ন প্রকার এই প্রোটিনের মধ্যেই কোনোটা

এরপর 11 পাতায়

চোখ এর সমস্যা

4 পাতার পর

চারবার ড্রপ এর মতন চোখের আক্রান্ত অংশে দিতে হবে।

পেয়ারা পাতাকে সিদ্ধ করে সেগুলি একটি ভেজা কাপড়ে সেঁক দেওয়ার জন্য ব্যবহার করতে হবে এবং চোখের লাল ভাব, যন্ত্রণা ও ফোলা কমতে সাহায্য করবে।

চেরাই করে ঘৃত কুমারী পাতা নিয়ে শাঁসালো অংশটি চোখের আক্রান্ত অংশে লাগাতে হবে।

প্রাকৃতিক ভাবেই আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়র স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটানো যেতে পারে। এর কিছু নমুনা দেওয়া হল ঃ—

অ্যাভোক্যাডো ঃ— এই গাছটির অংশ ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি ভিটামিন A, B_1, ও C তে পূর্ণ। যাদের চোখ শুকনো, অপটিক্যাল স্নায়ু বেসামাল তারা এর ব্যবহারে উপকার পাবেন। অ্যাভোক্যাডোর রস করে অথবা ফলের মতও ব্যবহার করা যেতে পারে।

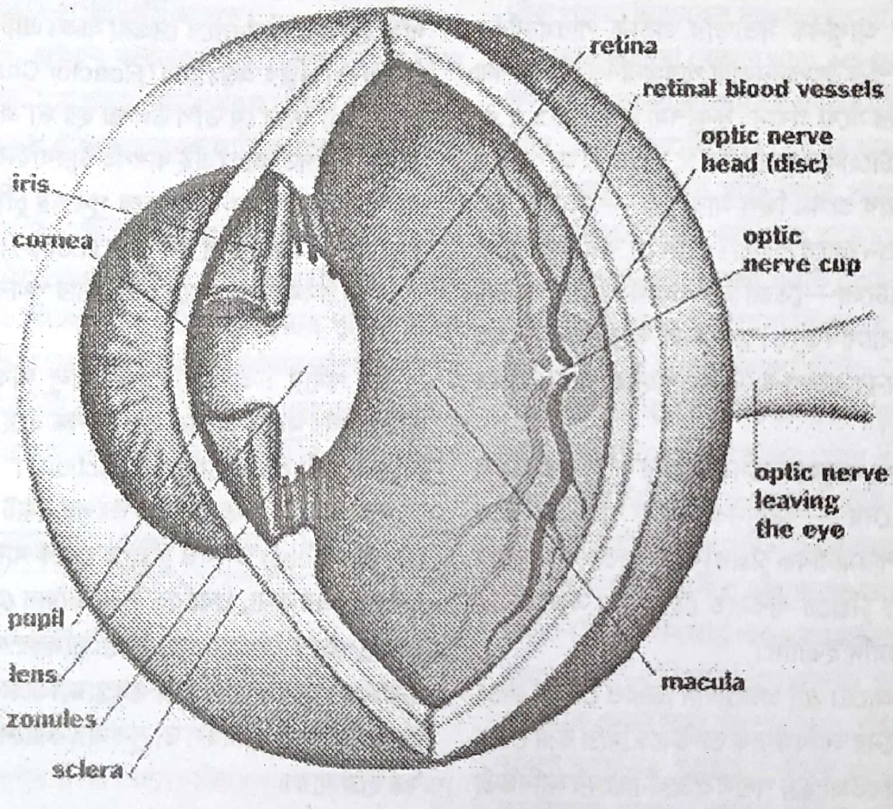

লেবু — ভিটামিন B_1 ও C-তে পূর্ণ। যাদের দৃষ্টিশক্তি কম এবং চোখের জন্য মাথা ব্যথা করে তারা লেবুর রস পান করলে ভালো হবে।

পান পাতা — এর পাতা চোখের প্রদাহ বা চোখের কারণে মাথা ব্যথা হলে কাজ দেয়। তিন গ্লাস জলে কিছু পান পাতা দিয়ে মিনিট কুড়ি ফুটিয়ে তা এক গ্লাস জলে পরিণত করে ইষদুষ্ণ বা ঠান্ডা জল পান করলে উপকার হবে।

পেঁপে — ভিটামিন A,C ও বিটা ক্যারোটিনএ পূর্ণ এই ফলটি। এটি মাইওপিয়া স্বল্প দৃষ্টিক্ষমতা ও চোখের জন্য মাথা ব্যাথায় পেঁপের জুস করে খেলে উপকার হবে।

টমেটো — ভিটামিন A, B_1 ও C তে পূর্ণ। মাইওপিয়া বা স্বল্প দৃষ্টি শক্তি সম্পন্ন বা সামনের নজর কম বা অ্যাসটিম্যাগটিজম্ যাদের আছে তাদের জন্য টমেটো একটি পরিপূর্ণ আহার্য।

গাজর — যাদের মাইওপিয়া, স্বল্প দৃষ্টি শক্তি সম্পন্ন, সামনের দৃষ্টি কম আছে তারা ভিটামিন A, B_1 ও Cতে পরিপূর্ণ গাজর তাদের জন্য একটি পরিপূর্ণ আহার।

তিল তেল — স্বল্প দৃষ্টি শক্তি সম্পন্ন, সামনের দৃষ্টি কম, অ্যাসটিম্যাগটিজম্ আছে চাদের জন্য ভিটামিন A, B ও Cতে পরিপূর্ণ তিল তেল খুবই খুবই উপকারী। প্রতিদিন ২ টাকা শুধু তেল অথবা জুস এর সাথে নিজেও মিশ্রণ করে খেতে পারা যেতে পারে।

কাঠ বাদাম — দুধে কাঠ বাদাম ভিজিয়ে সারা রাত রেখে দিতে হবে। সকালে বাদামগুলি তুলে ঐ দুধে চন্দন মেশাতে হবে। ঐ মিশ্রণ চোখের পাতায় লাগাতে হবে। চাপের কারণে চোখ লাল হওয়া কমাতে এটি সাহায্য করে।

এলাচ — দুটি ছোট এলাচ দিয়ে গুঁড়ো করে দুধের মধ্যে মেশাতে হবে। ঐ দুধ গরম করে রাত্রে পান করতে হবে। এই অভ্যাসটি চোখের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সাহায্য করবে।

আমলকিতেও প্রচুর ভিটামিন C আছে এবং এটিও চোখের পক্ষে উপকারী। গোলাপজল এবং লেবুর রস সমান ভাবে মিশিয়ে চোখের ড্রপ হিসাবে ব্যবহার খুবই প্রভাবশালী পদ্ধতি চোখের শক্তি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে। রোজ আখরোট খেলেও দৃষ্টি শক্তি ভালো থাকে।

গোলাপ জল ও ১/৭ অংশ ফিটকিরির মিশ্রণ দিয়ে দু-তিন ফোঁটা করে প্রতিদিন চোখে দিলে চোখের দারুন উপকার পাওয়া যায়। কাঠ বাদাম, ফেনেল (এক ধরণের সুগন্ধি উদ্ভিদ) মিছরি সমপরিমান নিতে হবে এবং একটি পেষ্ট (মলম) বানাতে হবে। মিশ্রণ এর দু-চামচ ইষদুষ্ণ গরম দুধে দিয়ে শোয়ার সময় চোখে মেখে নিলে চোখের রোগ দূরে থাকবে।

আম খাওয়াও চোখের পক্ষে খুবই ভালো। এর মধ্যে প্রচুর ভিটামিন এ এবং ক্যালসিয়াম পাওয়া যায় যা চোখ ভালো থাকার জন্য বিশেষ প্রয়োজন।

কাজেই এই সবিজি যা ফল গুলির অনেকগুলিই আমাদের কাছে অতি সহজ লভ্য যার সাহায্য আমরা সহজেই নিতে পারি। সুতরাং আর সময় নষ্ট না করে এখন থেকে এগুলির ব্যবহার করলে অনেক চোখের রোগের হাত থেকে সহজেই নিষ্কৃতি পাওয়া যেতে পারে।

লেখক ঃ নির্মাল্য দাশগুপ্ত। ফোন ঃ ০৮৯৮১৭২৪৯১৫
শিক্ষক, শ্যামনগর কান্তি চন্দ্র হাইস্কুল (উঃ)

তথ্য সূত্র ঃ—Science Repoter Sept : 2011

ফুকুশিমা : অতঃ কিম্

১১ই মার্চ, ২০১১। সময় ১৪ঃ৪৬। জাপানী সমুদ্রতলের দৈত্যাকার পাথরের প্লেটগুলি নড়াচড়াতে পরস্পর আটকে গেল। সৃষ্টি হল ভীষণ শক্তি। ভেঙ্গে গেল প্লেট। শুরু হল ভূকম্পন (রিখটার স্কেলে ৯)। উপরের সমুদ্রজলে দেখা দিল ভারসাম্যের অভাব। জলোচ্ছাসের উচ্চতা ছাড়িয়ে গেল ১৪ মিটার। সুনামির সেই সুউচ্চ ঢেউ আছড়ে পড়লো জাপানী সমুদ্রতটে। আধুনিক সভ্যতার নিদর্শনগুলো হয়ে গেলো খড়কুটো। মৃত্যু হলো ১২,৩৪১ জনের। ১৫,০০০ এর বেশি হারিয়ে গেলো। তবু দুঃখের পাঁচালী এখানেই শেষ হয়নি। ঘটলো সেই ভয়ংকর ঘটনাও। সুনামি আছড়ে পড়লো জাপানের আধুনিক সভ্যতার প্রতীক পারমানবিক চুল্লিগুলির উপর। এগারোটা শক্তি উৎপাদনকারী পারমানবিক চুল্লি আপনা আপনি বন্ধ হয়ে গেল। এদের মধ্যে প্রধান - ফুকুশিমা দাই-ইচী ১,২,৩, ফুকুশিমা দাইনি ১,২,৩,৪, টোহোকুস গুনাগোয়া ১,২,৩ এবং জাপাকোস টাকাই। এর মধ্যে ফুকুশিমার জখম ছিল মারাত্মক — চুল্লিতে হল হাইড্রোজেন বিস্ফোরণ। আগুন লেগে গেলো। শেষে যে 'ভয়' সকলকেই ভয় পাইয়ে রাখে—তাও ঘটলো—তেজস্ক্রিয় পদার্থ ছড়িয়ে পড়লো চুল্লি থেকে ২০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধ জুড়ে। স্থল, জল, অন্তরীক্ষ—কিছুই রক্ষা পেল না। এমনকি জাপানের রাজধানী টোকিও শহরও তার আতঙ্কিত চুম্বন থেকে রেহাই পেল না।

এইসব ভয়ঙ্কর ঘটনাগুলো মানুষকে অসহায় করে তুলে কতকগুলি প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয় — আধুনিক প্রযুক্তি দ্বারা প্রকৃতিকে কতটা ঠেকিয়ে রাখা যাবে? পারমানবিক চুল্লির বিপদগ্রস্থতা — মানুষের জীবনের সাথে কতটা যুক্ত? চুল্লিতে ব্যবহৃত তেজস্ক্রিয় বস্তু সত্যিই ঠিক কতটা বিপজ্জনক? ইত্যাদি ইত্যাদি।

সব প্রশ্নেরই যেমন উত্তর আছে। এই প্রশ্নগুলির উত্তরও খোঁজা যেতে পারে। এর সূচনা পরমাণু গঠনের আবিষ্কারক ডাল্টনকে দিয়ে করা যেতে পারে অথবা ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের তেজস্ক্রিয় পদার্থ ইউরেনিয়ামের আবিষ্কর্তা হেনরি বেকরেলকে দিয়ে অথবা কুরী দম্পতিকে (১৮৯৮) দিয়ে — যারা তেজস্ক্রিয় পদার্থ রেডিয়াম ও পোলোনিয়ামের আবিষ্কর্তা। এই সবকটি পদার্থই স্বয়ংক্রিয়ভাবে তেজস্ক্রিয় আলফা, বিটা, গামা রশ্মি বিকিরণ করে সুস্থিত পদার্থ হতে চায়। যদিও এই সুস্থিতির জন্য এদের বহু বহু বছর অপেক্ষা করতে হয়। অর্থাৎ বহু বছর ধরে মানুষের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর বিকিরণ বজায় রাখে। আবার ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দকে ধরা যেতে পারে — যখন আর্নেষ্ট রাদারফোর্ড দেখালেন—একটা পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে আলফা রশ্মি দিয়ে ভাঙা যায়। উৎপন্ন হয় নিউট্রন কণা। সাথে পাওয়া যাবে প্রচুর পরিমান শক্তি। উদাহরণস্বরূপ শুধুমাত্র একটি ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াস ভাঙ্গলে উৎপন্ন শক্তির পরিমান একটা কার্বন কণা পোড়ানোর চেয়ে পাঁচ কোটি গুণ বেশি হবে। শুধু তাই নয় উৎপন্ন নিউট্রনগুলি অন্য নিউক্লিয়াসকে ভাঙ্গে ফলে বিক্রিয়ার শৃঙ্খল (Chain Reaction) তৈরী হয়। ফলে শক্তি উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। বিক্রিয়া অনিয়ন্ত্রিত হলে—ফল, এটম বোমা। অন্য দিকে নিয়ন্ত্রণ করে একে দৈনন্দিন বিদ্যুতের চাহিদা মেটানোর কাজে ব্যবহার করা যায়। পারমানবিক চুল্লিতে নিয়ন্ত্রিত শক্তি সৃষ্টি করা হয়। জ্বালানি হিসাবে তেজস্ক্রিয় পদার্থ ইউরেনিয়াম ২৩৫ ব্যবহার করা হয়।

এটুকু জানলেও, জানা হয় না, কি করে এই তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলি থেকে শেষ পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। কি করেই বা সুউচ্চ ঢেউ প্রায় ধ্বংস করে দেয় চুল্লির কাজকর্ম। ছড়িয়ে দেয় ক্ষতিকারক তেজস্ক্রিয় কণা। ঝাঁকিদর্শনে—সবচেয়ে বৃহৎ অথচ সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ ফুকুশিমা দাই-ইচী এর গঠন দেখে নেওয়া যাক। এটি একটি স্ফুটন জলের চুল্লি (BWR)। চুল্লির অন্তঃস্থলে (Reactor Core) নিউক্লিয়ার বিভাজনের (Fission) ফলে যে তাপ উৎপন্ন হয় তা প্রবাহিত জলকে উত্তপ্ত করে বাষ্পে পরিণত করে। এই বাষ্পই টারবাইনকে ঘোরাতে ব্যবহৃত হয়। এরপর এই বাষ্পকে ঠান্ডা করে পুনরায় চুল্লির অভ্যন্তরে নিয়ে যাওয়া হয়। সম্পূর্ণ হয় সম্পূর্ণ এক ফাঁস (Loop)।

এখন প্রথম থেকে ধ্বংসে পৌছানোর পর্যায়গুলো দেখে নেওয়া যাক—

১ম পর্যায় : আগের মুহূর্তে চালু থাকা ১, ২, ৩ ইউনিটগুলি ভূমিকম্পের মুহূর্তে আপনা আপনি বন্ধ হয়ে যায়। বন্ধ হয়ে যায় 'শৃঙ্খল বিক্রিয়া' (Nuclear Chain Reaction)।

২য় পর্যায় : কিন্তু চুল্লিতে উৎপন্ন মোট তাপের দুই শতাংশ তাপ (Decay heat) তখনও চুল্লিতে থেকে যায়। এই তাপ সরিয়ে ফেলা দরকার। এর জন্য, প্রবাহিত ঠান্ডা জলের স্রোত ছাড়াও জরুরী ভিত্তিক জলের স্রোত দেওয়া হয়। কিন্তু ভূমিকম্পের ফলে চুল্লির বৈদ্যুতিক প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। বিকল্প ব্যবস্থায়, ডিজেল জেনারেটর (DGS) এর যে ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল তা সুনামীর কারণে ভূমিকম্পের এক ঘন্টা পরে বন্ধ হয়ে যায়।

ফলত: ঠান্ডা করার পাম্প থেমে যাওয়ার ফলে ঠান্ডা জলের স্রোত বন্ধ হয়ে যায় এবং এরই জন্য জ্বালানী তেজস্ক্রিয় পদার্থের তাপ বেড়ে যেতে থাকে। পার্শ্ববর্তী জল ফুটতে থাকে। চুল্লির অন্তঃস্থলের (Reactor core) বাইরের রক্ষাবরণের (Zircalloy cladding) সাথে বাষ্পের বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়।

৩য় পর্যায় : এখন জ্বালানীর মধ্যে ঐ অতিরিক্ত তাপ (decay heat) ঠান্ডা জলের প্রবাহের অনুপস্থিতিতে উত্তপ্ত বাষ্প চুল্লীর কাঠামোতে চাপ বাড়িয়ে দেয়। এই চাপ কমিয়ে দেওয়ার জন্য, উত্তপ্ত বাষ্পকে সংলগ্ন বড় জলাধারে (Wet well, supression pool) পাঠিয়ে দেওয়া হয়। যেহেতু চুল্লি আধারের চাপ কমানোর জন্য এই ঘটনা বার বার ঘটানো হয়, সুরক্ষা বলয়ের (Primary containment) চাপ লক্ষনীয়ভাবে বেড়ে গিয়েছিল, ফলে উত্তপ্ত বাষ্পকে ধরে রাখতে আর পারলো না। বাষ্পকে

এরপর 11 পাতায়

ফুকুশিমা : অত: কিম্

10 পাতার পর

মুক্তি দিল। ফলে উত্তপ্ত বাষ্প হাইড্রোজেন গ্যাসের সঙ্গে পরবর্তী বাইরের গৌণ সুরক্ষা বলয়ে (Seconday containment) পড়ল। ফলশ্রুতিতে— বাইরের সুরক্ষা বলয় ভেঙ্গে হাইড্রোজেন গ্যাসের বিস্ফোরণ ঘটলো। হাইড্রোজেন বিস্ফোরণ চুল্লির ১,৩ এবং ৪ এর ছাদ উড়িয়ে দিল। বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে তেজস্ক্রিয় কণাও ছড়িয়ে পড়ল।

চতুর্থ পর্যায় : বিপদ কমানোর উদ্দেশ্যে অর্থাৎ চুল্লির অন্তঃস্থলের তাপ কমানোর জন্য, বোরন মেশানো সমুদ্র জল ব্যবহার করা হলো। বোরণ আবার নিউট্রন শোষন করে চুল্লির ক্ষতিও করে। ফলে ফুকুশিমা দাই-ইচীর সমস্ত চুল্লিগুলো এখন ঠান্ডা হয়ে বন্ধ হয়ে আছে। সমুদ্র লবণ চুল্লির রডগুলির উপর এক ধরণের আস্তরণও তৈরি করে।

পঞ্চম পর্যায় ঃ আরো ভয়ের কারণ দেখা দিয়েছে—ইউনিট ২ এর জলাধার (Wet well) ভীষণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, এতসব কান্ডকারখানা চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে— যে বিষ তেজস্ক্রিয় পদার্থ পারমানবিক চুল্লিতে ব্যবহার করা হচ্ছে, তা শত সুরক্ষা বলয়ে রাখলেও অবশ্যম্ভাবী ভাবে সুরক্ষিত থাকে না। অতএব অতঃ কিম্ ?

দেখা গেলো, জাপান তার 'পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কারিগরী বিদ্যা'কে সাথে নিয়েও পরমাণু চুল্লির বিপদজনক ঝুঁকিকে এড়াতে পারলো না। কোটি কোটি বছর ধরে নির্মিত জীবের প্রাণ ধারণের একমাত্র পৃথিবী গ্রহের দ্রুত সর্বনাশ ঘটানোর আগে আমরা কি আরো একবার ভাববো না ? যে বিপুল অর্থ পরমাণু চুল্লির নির্মাণে ব্যয়িত হয়—তা দূষণমুক্ত পৃথিবীবে সাথে নিয়ে—বিকল্প শক্তির সাধনায় ব্যয়িত করা যায় কিনা তা বারবার ভাবা উচিত। -

লেখক ঃ-তাপস মজুমদার, মোঃ-৯৮৭৪৭৭৮২১৬

হিউম্যান

4 পাতার পর

হিমোগ্লোবিন গঠন করে, কোনোটা দেহের প্রয়োজনীয় উৎসেচক বা হরমোন গঠন করে, তো আবার কোনো কোনোটা উৎসেচক হিসেবে ক্যান্সার ঘটাতে সাহায্য করে।

প্রোটিনের চূড়ান্ত রূপের উপর জিনের নিয়ন্ত্রণ যে জোরালো নয় তার প্রত্যক্ষ উদাহরণ হল—স্মৃতিনাশক অ্যালজাইমার্স রোগ। এই রোগের জন্য দায়ী অ্যামাইলয়েড প্রোটিন। স্নায়ুতন্ত্রে বিটা অ্যামাইলয়েড প্রোটিন জমে জট পাকানো স্নায়ুতন্ত্র তৈরি করে। আর এই ঘটনাকেই আলজাইমার্স রোগের কারণ ধরা হয়। এই রোগে মানুষের স্মৃতি শক্তি নষ্ট হতে থাকে। এই অ্যামাইলয়েড প্রোটিন তৈরির সংকেত এখনও পর্যন্ত সরাসরি কোনো জিনের মধ্যে পাওয়া যায়নি।

প্রোটিন বিজ্ঞানীদের মতে, যে সমস্ত ঔষুধ আমরা ব্যবহার করি তার ৯৯% ভাগই প্রোটিনজাত। এরা আবার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেহে উপস্থিত সংশ্লিষ্ট প্রোটিনের সাথে যুক্ত হয়ে কাজ করে। একদিকে রোগের জীবানু যেমন প্রোটিন, তেমনি রোগ প্রতিরোধক 'অ্যান্টিবডি'ও প্রোটিন। শরীরে অস্বাভাবিকত্ব মানেই প্রোটিনজনিত গোলাযোগ। আর যে কারণেই আজ বিজ্ঞানীরা এগিয়ে এসেছেন প্রোটিন গবেষণায়, প্রোটিন সংশ্লেষ সম্পর্কে আরও বিশদে জানতে।

ঔষধ শিল্পে প্রোটিন বিজ্ঞানের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ইতিমধ্যে বহু বহুজাতিক ওষুধ উৎপাদক সংস্থা তাদের পুঁজি নিবেশ করছে আরও বেশি করে। ইতিমধ্যে এমনই এক সংস্থা প্রায় ৯০,০০০ বার্তাবহ (এমআরএনএ) আরএনএ বিশ্লেষন করে প্রোটিন সংশ্লেষের পদ্ধতির সন্ধান পেয়েছে। এই সংশ্লেষ পদ্ধতি বিশ্লেষণ করলে রোগ সৃষ্টিকারী প্রোটিনের রহস্য ভালোভাবে জানা যাবে। বিখ্যাত ঔষুধ উৎপাদক সংস্থা নোভার্টন 'গ্লিভেক' নামক ঔষুধ তৈরি করেছে যা জটিল লিউকিমিয়া বা ব্লাডক্যান্সারের জন্য দায়ী টাইরোসিন কাইনেজ প্রোটিন (এক রকম উৎসেচক) সরাসরি রোগের কারণকে ধ্বংস করে তাই এর কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। এর আগে কেমোথেরাপির সাহায্যে এই রোগের চিকিৎসা করা হতো, ফলে রোগক্লিষ্ট কোশের পাশাপাশি ভাল কোষও মারা পড়ত। গ্লিভেকের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে বহু কোম্পানী প্রোটিন বিজ্ঞানের সাহায্যে রোগের ওষুধ, আবিষ্কারে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। অচিরেই ফুসফুস ও স্তনের ক্যান্সারের এরকমই ঔষুধ ইতিমধ্যে বাজারে পাওয়া যাবে। এই ওষুধগুলি উক্ত রোগের জন্য দায়ী উৎসেচকটিকে সরাসরি ধ্বংস করে রোগের মুক্তি দিতে পারে। সম্ভবত 'টিউমার' থেকেও রোগমুক্তির উপায়ও আবিষ্কার হতে চলছে এ পথেই।

এই আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি প্রোটিন বিজ্ঞানের ক্ষুদ্র সংস্করণ মাত্র। প্রোটিন বিজ্ঞানের মূল রহস্য কিন্তু রয়ে গেছে পলিপেপটাইড শৃঙ্খলের বিভিন্ন ভাঁজের মধ্যে। পলিপেপটাইড তৈরির কারখানা (রাইবোজোম) থেকে বেরিয়ে আনার পর এগুলিকে মালার মতো দেখায়। এই মালাগুলির ভাঁজ নানান আকার ধারণ করে। আর এই আকারের উপর নির্ভর করেই নির্দিষ্ট প্রোটিনের গঠন। পলিপেপটাইডের এই ভাঁজ ঠিকঠাক না হতে পারলেই গোলমেলে প্রোটিন তৈরি করে যা রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এর আগে বিজ্ঞানীরা কল্পনাকেও ভাবতে পারেননি, তাদের রহস্যময় প্রোটিন নিয়ে আবিষ্কার এক সময় দূরারোগ্য রোগ ব্যধি সারাতে সাহায্য করবে। প্রোটিন বিজ্ঞান নিয়ে এখনও বহু কাজ বাকি। এক সময় বিষয়টি একদিকে যেমন সময় সাপেক্ষ ছিল, তেমনি ব্যয় বহুলও ছিল। বর্তমানে অবশ্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রোটিন চেনার কাজ অনেক তাড়াতাড়ি চলছে। পদার্থ বিদ্যায় বা রাসায়নিক বিদ্যায় ব্যবহৃত স্পেক্টোমেট্রি এক্সরে ক্রিস্ট্যালোগ্রাফি বা ইলেকট্রোস্প্রের সাহায্যে এই গবেষণা চালানো হচ্ছে। যদিও এই কাজটি যথেষ্টই শ্রমসাধ্য। প্রোটিনের পলিপেপটাইড শৃঙ্খলের ভাঁজ বিষয়টি প্রথম লক্ষ্য করেন নোবেল জয়ী বিজ্ঞানী লিনাস পাউলিং। পরবর্তীতে আরেক নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী ক্রিশ্চিয়ানো আনফিন্সেন আবিষ্কার করেন। প্রোটিন অণুর অস্বাভাবিক পরিবর্তনের জন্য দায়ী কোনো রাসায়নিক ভিত্তি। ঘটনা যাই হোক, প্রোটিন গবেষণা সারা বিশ্বজুড়ে সঠিক ভাবে চালানোর জন্য হিউম্যান জিনোম অর্গানাইজেশনের আদলে ইতিমধ্যেই 'হিউম্যান প্রোটিওম অর্গানাইজেশন' বিজ্ঞানী স্যাম হানাশ এর তত্ত্বাবধনে গড়ে উঠেছে ভবিষ্যৎ এর দিকে তাকিয়ে। —লেখক ঃ রাজা রাউত, জলপাইগুড়ি, সায়েন্স এন্ড নেচার ক্লাব। ফোনঃ ৯৪৭৪৪১৭১৭৮, Email : rajarouthbhbl@gmail.com

জলাভূমির সমীক্ষা

5 পাতার পর

৫) যমুনাদিঘি ঃ— এই দিঘির পরিবেশ ভালো, পাড়ে ঘাস রয়েছে। জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নেই। ধারে গাছ পালা নেই।

৬) মালি দিঘি ঃ— পাড়ে ঘাস রয়েছে, পরিবেশ ভালো, গাছপালা রয়েছে। পাখি দেখা যায়।

৭) বৈরাগী দিঘি ঃ— পরিবেশ ভালো, পাড়ে ঘাস রয়েছে, বড় বড় গাছ রয়েছে। পাখি দেখা যায়।

৮) লাল দিঘি ঃ— ২ বছর আগে সংস্কার করা হলেও বর্তমানে নোংরা আবর্জনা মিশছে, দোকান, বাড়ীর মলমূত্র মিশছে। জল দূষিত।

৯) রাজবাড়ী দিঘি ঃ— নাব্যতা কমছে, আবর্জনার পরিমাণ বাড়ছে। মাছ চাষ হয়।

১০) মৈত্রী সংঘ দিঘি ঃ— মলমূত্র, নোংরা আবর্জনা মিশছে, দিঘির আয়তন কমছে। জল ভীষণ ভাবে দূষিত।

১১) এন.এন. পার্ক ঃ— পরিবেশ ভালো, গাছপালা রয়েছে, মাছ চাষ হয়। পাখি দেখা যায়।

১২) মরাতোর্ষা খাল (নদী) ঃ— শহরের লাগোয়া তোর্ষা নদীর সঙ্গে সংযোগ, বর্তমানে এটি প্রায় মজে গিয়েছে, বৃষ্টি হলে আশপাশের গ্রামগুলিতে সাময়িকভাবে জল জমে যায়। নিকাশী ব্যবস্থা বিপর্যস্ত।

১৩) মুস্তাফি দিঘি ঃ— নোংরা আবর্জনা সহ প্রায় ভরাট হয়ে যাচ্ছে। শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত।

১৪) অঙ্গরাই দিঘি ঃ— ২০০৯ সালে সংস্কার করা হলেও বর্তমানে স্নান করা, কাপড় কাচা, আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। দিঘির পরিবেশ দূষিত।

১৫) রাজমাতা দিঘি ঃ— স্নান করা, কাপড় কাচা হয়, নোংরা আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। দীর্ঘদিন সংস্কার করা হয়নি, আয়তন হ্রাস পাচ্ছে, পরিবেশ দূষিত হয়ে পড়েছে।

সমীক্ষায় আরও জানা যায় ১৯৯৮ সালে সরকারী উদ্যোগে ৪টি জলাশয় রাজবাড়ীর ২টি ঝিল, খালাসি পট্টির ভিতরে ১টি দিঘি, সার্কিট হাউসের জলাশয় ও গান্ধী কলোনীর পুকুর। শহরের প্রায় ১২-১৫টি জলাশয়-নোংরা আবর্জনা ফেলে ভরাট হবার মুখে। সামগ্রিক ভাবে প্রায় প্রতিটি জলাশয়ই পরিবেশ সংকটের মুখোমুখি।

উপসংহার ঃ কোচবিহার রাজাদের আমলে তৈরী দিঘিগুলির সংরক্ষণ ও সংস্কার করা একান্ত প্রয়োজন। জলাশয় সংরক্ষণ আইনানুযায়ী মাছ চাষের জন্য দিঘিগুলিকে ব্যবহার করা প্রয়োজন। মাছের উৎপাদন বাড়বে, অর্থনৈতিক ভাবে জলাভূমিকে ব্যবহার করে এক নতুন জীবনদর্শন পাওয়া যাবে। পরিবেশ নির্মল থাকবে, দূষণ কমবে, পাশাপাশি পুষ্টির চাহিদা মিটবে।

—জয়দেব দে, মোঃ-৯৪৭৪৩৩০০৯২

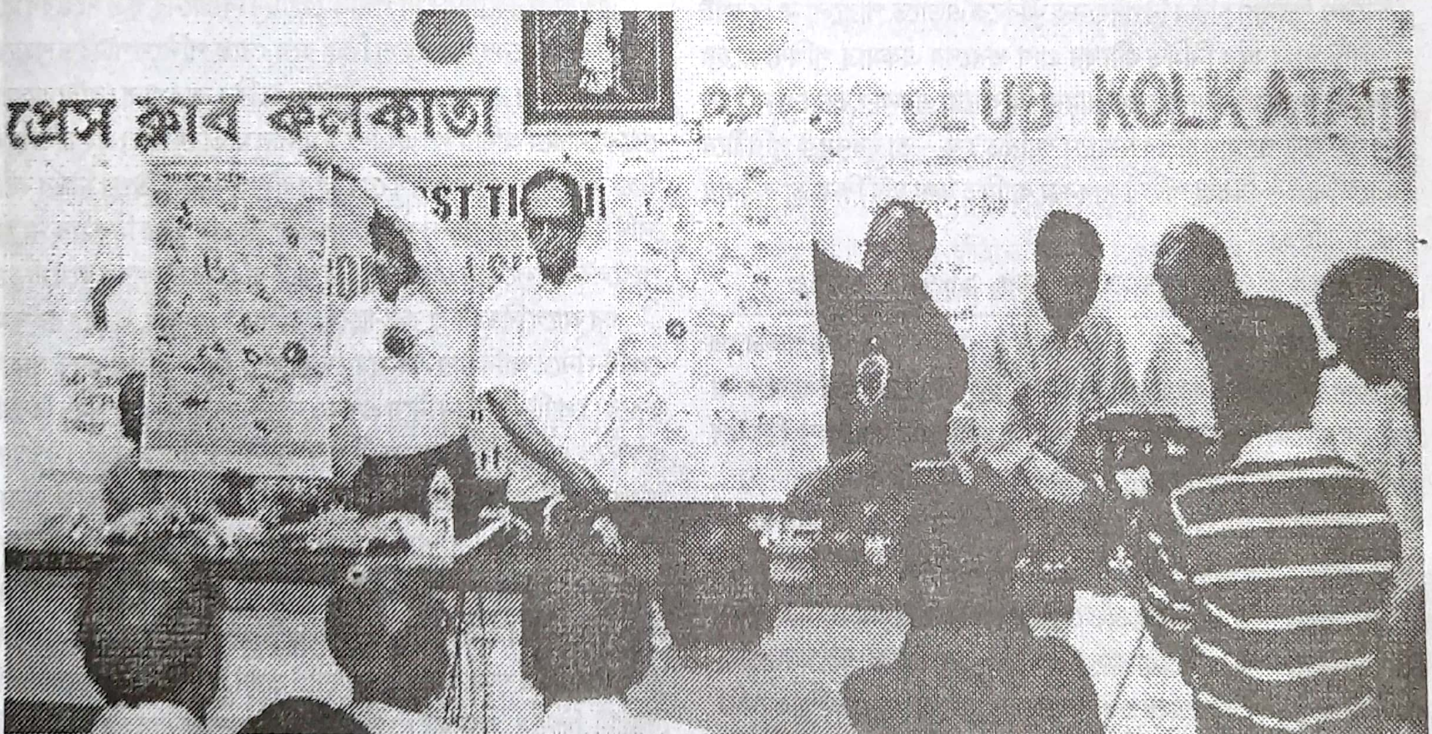

ক্যানিং যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা আয়োজিত সর্বভারতীয় সাপ মানচিত্র প্রকাশ অনুষ্ঠান। কলকাতা প্রেস ক্লাব। ছবি ঃ ডাঃ দয়াল বন্ধু মজুমদার।

যোগাযোগ—বিজ্ঞান দরবার, ৫৮৫, অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদনগর), পোঃ কাঁচরাপাড়া ৭৪৩১৪৫, উঃ ২৪ পঃ। ফোন ঃ ০৩৩-২৫৮০-৮৮১৬, ৯৪৭৪৩৩০০৯২।
সম্পাদক মন্ডলী—অভিজিৎ অধিকারী, বিবর্তন ভট্টাচার্য, বিজয় সরকার, সুরজিৎ দাস, তাপস মজুমদার, চন্দন সুরভি দাস, চন্দন রায়, কিঞ্জল বিশ্বাস।

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদ নগর) পোঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পোঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত।
অক্ষর বিন্যাস ঃ রিম্পা কম্পিউ, কাঁচরাপাড়া হাইস্কুল মোড়, কাঁচরাপাড়া, চলভাষ ঃ ৯৮৩৬২৭১২৫৩
সম্পাদক—শিবপ্রসাদ সরদার। ফোন ঃ ৯৪৩৩৩৩৪৩৮০) E.mail-ganabijnan@yahoo.co.in